OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 90
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 727 - 731
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - ii, Published on April issue 2026, Page No. 727 - 731
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

দক্ষিণ বাঁকুড়ার লুপ্তপ্রায় লোকসংস্কৃতি 'জলমাসই' গান : একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

দেবাশীষ কর্মকার
SACT-1, বাংলা বিভাগ
বড়জোড়া কলেজ, বাঁকুড়া
Email ID: debashiskarmakar91@gmail.com

Received Date *30. 03. 2026*
Selection Date *07. 04. 2026*

Keyword
Jalmasai Songs, Bauri Community, South Bankura, Folk Culture, Ritual Music, Jalmathakuran, Wedding Traditions, Social Identity, Khatra Subdivision, Oral Tradition.

Abstract
This research paper by Debasish Karmakar explores 'Jalmasai', a nearly extinct folk song tradition practiced by the Bauri community in the South Bankura region of West Bengal. Geographically, South Bankura comprises the Khatra subdivision, characterized by its dense forests, rivers like the Kasai, and a population largely consisting of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The Bauri community, identified as the largest Scheduled Caste group in this region with a population of approximately 55,000, are the primary practitioners and creators of these songs.

The term 'Jalmasai' refers to ritualistic songs performed specifically during wedding ceremonies. They are deeply rooted in the local landscape and the community's socio-economic reality. The ritual begins on the wedding evening when the bride or groom is taken to a local pond. A symbolic act of 'cutting the water' (drawing a square in the water) is performed with a sickle, followed by the worship of a decorated egg, known as 'Jalmathakuran'.

The lyrics of these songs offer a poignant reflection of the Bauri people's lives. Themes range from the universal pain of a mother parting from her daughter—likened to the mythological sorrow of Menoka for Uma—to social commentaries on beauty and utility using metaphors like the Palas flower. The songs also highlight the harsh realities of poverty and water scarcity. Some lyrics describe the consumption of 'Bhutmuri' rice and 'Kutti' pulses, common staples for the impoverished, while others express the reverence for water as a deity, reflecting the region's long-standing water crisis.

Ultimately, Jalmasai songs are more than just musical expressions; they are a repository of the Bauri community's collective identity, capturing their joys, sorrows, and daily struggles. Despite their cultural significance, these songs are fading due to a lack of formal education and the slow encroachment of modern civilization. The author emphasizes that these songs breathe life into

Otherwise inanimate rituals, serving as a unique cultural asset of the Bauri women in South Bankura.

Discussion

"বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর।"[১]

জীবনানন্দ দাশের 'রূপসী বাংলা'র মুখ যেন থরে থরে সাজানো আছে দক্ষিণ বাঁকুড়ার নদ-নদী, পাহাড়, অরণ্য-প্রান্তর, লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতির মর্মমূলে। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণে খাতড়া মহকুমা। এই অঞ্চলটি দক্ষিণ বাঁকুড়া নামে পরিচিত। এই অঞ্চলটির আয়তন ২৪০৭.৪৯ বর্গ কিমি।[২] দক্ষিণ বাঁকুড়ার ভৌগোলিক সীমানা - উত্তর গোলার্ধের ২২°৫৭" থেকে ২৩°৩৮" উত্তর অক্ষরেখা এবং দ্রাঘিমাংশ হল ৮৭°১৮" থেকে ৮৬°৪৬" পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত।[৩] এই অঞ্চলের অধিকাংশ মানুষ তপশিলী জাতি ও উপজাতি অধ্যুষিত ফলে, প্রথাগত শিক্ষার থকে এদের অবস্থান অনেক দূরে। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনেকটা পিছিয়ে পড়া অঞ্চল, এরফলে আধুনিক সভ্যতার অভিঘাত বর্তমান সময়েও খুব বেশি দেখা যায় না। আমাদের স্মরণে রাখতে হবে কোন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটতে থাকে সেই অঞ্চলের ঐতিহাসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনা বিন্যাসের ফলে। সমাজ বিকাশের মর্গ্যানীয় তত্ত্বের অনুসন্ধান করলে আমরা দেখতে পাবো—

> "সমস্ত গোষ্ঠী বা কৌম একই সঙ্গে পা মেলাতে পারে না : প্রযুক্তিবিদ্যা ও অর্থনৈতিক বিকাশ যাদের উন্নততর হয়, তারাই এগিয়ে যায় অন্যরা পিছিয়ে থাকে।"[৪]

এই 'জলমাসই' গানের রূপকার বাউরি জাতি বা জনগোষ্ঠীর মানুষ। তারা সমাজে পিছিয়ে পড়া জাতি হিসেবে চিহ্নিত হলেও সাংস্কৃতিক দিক থেকে বিচার করলে তাদের লোকসংস্কৃতি উপাদান অনেক বেশি। দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে কাঁসাই নদীর সংলগ্ন বিভিন্ন গ্রামে এই উপজাতি মানুষের বসবাস। বিশেষ করে এখানকার বাউরি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই সংস্কৃতি বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করা যায়।

দক্ষিণ বাঁকুড়ার জনসংখ্যা (২০০১ জনগননা অনুসারে) ৯,১৯,৮৩৫ জন। তপশিলি জাতির সংখ্যা ২,২৭,৭২২ জন (২২%)। তপশিলি উপজাতির সংখ্যা ২,০৫,০২৭ জন (২২%)। অন্যান্য জনজাতি ৪,৮৭,০৮৬ জন (৫৩%)। বাঁকুড়া জেলায় জনবিন্যাসের ধারা সাধারণত ভূ-প্রকৃতি গঠনের উপর নির্ভর করে, তেমনি দক্ষিণ বাঁকুড়ার জনবিন্যাস মূলত প্রকৃতির উপর নির্ভরশীলতা দেখতে পাওয়া যায়। 'জনবিন্যাস' প্রবন্ধে গৌতম দে বলেছেন—

> "এই সমাজ বহুমাত্রিক। জীবিকা ও পেশা এর একটি দিক। জাতিবিন্যাস এর আরেকটি দিক। আবার জতিভেদ মূলত বৃত্তিনির্ভর। সবামিলিয়ে একটি গতিময় সমাজ যার মধ্যে যেমন আছে চলমানতা একই সঙ্গে পিছুটান, সমাজের পশ্চাদপদতা।"[৫]

২০০১ সালের জনগননা অনুসারে এই অঞ্চলের তপশিলি জাতির মাধ্যে বৃহত্তম হল - বাউরি সম্প্রদায়, এদের মোট সংখ্যা- ৫৫,০০০ জন। খাতড়া, ইন্দপুর, তালডাংরা, রায়পুর এদের বসবাস। অনেকে মনে করেন বাউরি জাতির উপর অষ্ট্রিক জাতির প্রভাব খুব অধিক। এই জাতির উৎস আদিবাসী জনজাতি থেকে।

বাউরি জাতির উৎপত্তি দিক থেকে গবেষক সুনীল দাস তাঁর 'রাঢ় সভ্যতা' গ্রন্থে বলেছেন—

> "'বগ' শব্দটি দিয়ে রাঢ় দেশে প্রচুর সংখ্যায় গ্রামের নাম আছে। যেমন— বগড়া, বাগড়া, বাগালিয়া, বদড়িচক > বগড়িচক, বগডাঙ্গা, বাগডিহা, বাগুলি, বাদুরপুর > বাহাদুরপুর, বাইগড়া, বাগৈলা ইত্যাদি। উপরোক্ত প্রতিটি গ্রামের নামের মতই মেদীনিপুরের গড়বেতায় 'বগড়ি' নামে একটি গ্রাম রয়েছে। বগআড়া > বগড়া > বাগড়ী > বাগড়ি > বাগরি > বাউরী > বাউড়ী। এইভাবে 'বাউড়ী' জনগোষ্ঠীর নামের উৎপত্তি হয়। বাংলায় 'বাউড়ী' ইংরেজিতে 'BAURI' লেখে বা লেখা হয়। পরে 'BAURI' ইংরেজি লেখা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 90
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 727 - 731
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> থেকে বাংলায় ‘বাউরী’ লেখা হচ্ছে। এখনও বহু লোকে বাউরী-ই লেখে, আসলে ‘বাউরী’ না হয়ে হবে ‘বাউড়ী’। এটাই আদি উচ্চারণ।”[৬]

দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে এই জাতি অনেকটা পিছিয়ে পড়া গরিব জাতি, বেশিরভাগ এই মানুষের নির্দিষ্ট কোন জীবিকা নেই। অনেকে মাঠে কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত হলেও রাজমিস্ত্রির সঙ্গে জোগাড়ের কাজেও এদের দেখা যায়। সচেতনতা ও শিক্ষার অভাব এই জাতির মধ্যে দেখা যায়। অশিক্ষা, অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে এরা জীবন অতিবাহিত করে। লোকসংস্কৃতিবিদ্ মিহির চৌধুরী কামিল্যার মতানুসারে—

> “রাঢ়ের এক প্রাচীন জাতি বাউরী। এদের আদি বাস হাজারীবাগ।”[৭]

দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রীতির প্রচলন রয়েছে। এই অঞ্চলে বিভিন্ন লোকসঙ্গীতের বিষয়বস্তু বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। আমরা দেখেছি এই বিচিত্র লোকসংগীতগুলি এখানকার গ্রামীণ সমাজ থেকেই উদ্ভূত এবং এই সমাজে তার প্রচার ও প্রসার হয়ে থাকে। এখানে ‘বাউরি’ সম্প্রদায়ের বিবাহ অনুষ্ঠানে এই সংস্কৃতির প্রচলন পাওয়া যায়। এদের বিবাহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ‘জলমাসই’ নামক এক প্রকার গানের প্রচলন রয়েছে। এটি একটি অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি। তবে এই ‘জলমাসই’ গান গাওয়ার পূর্বে কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা পালন করা একান্ত দরকার। বিবাহের দিন সন্ধ্যে বেলায় বর বা কনেকে নিয়ে পুকুর ঘাটে যাওয়া হয়। সাথে থাকে সারিবদ্ধ মেয়ের দল। সকলের সামনে থাকে বর বা কনের মা। তার হাতে থাকে বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানো একটি থালা। বিভিন্ন উপকরণের মধ্যে ‘দা’ অর্থাৎ ‘কাস্তে’ থাকে। এই ‘কাস্তে’ দিয়ে পুকুরের জল কাটা হয়। জল কাটা হয় বলতে জলের মধ্যে চৌকোনো চিহ্ন আঁকা হয়। জল কাটার পর্ব শেষ হয়ে গেলে থালার উপরে রাখা একটি ডিমকে ওই ঘাটের মধ্যে নামানো হয় এবং বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজিয়ে নেওয়া হয়। যেমন সিঁদুর, দুর্বা ঘাস, চন্দন, হরীতকী ইত্যাদি। সাজিয়ে নেওয়ার পর ডিমটিকে পূজা করা হয়। একে বলা হয় ‘জলমা ঠাকুরণ’ এর পূজা। পূজা শেষ হয়ে গেলে বর বা কনেকে স্নান করিয়ে সকল মেয়েরা সুরে সুর মিলিয়ে গান গাইতে গাইতে ঘরে ফিরে আসে। গানগুলো আকারে ছোট হলেও সুর করে গাইলে অতি মধুর লাগে। লোকসমাজে সৃষ্ট এই গানগুলোকে - ‘জলমাসই’ গান বলা হয়। দক্ষিণ বাঁকুড়ার বিস্তীর্ণ জনপদে লোকসঙ্গীত ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা কল্পনা করা যায় না। এই ‘জলমাসই’ গানে আমরা সমাজ জীবনের অতি পরিচিত ছবি উঠে আসে। মা ও মেয়ের মধ্যে ভালোবাসার সম্পর্ক ফুটে উঠে। বাংলা মধ্যযুগের সাহিত্য শাক্ত পদাবলীতে যেমন আমরা উমাকে বিদায় দেওয়ার বেদনা, যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে মা মেনকার মধ্যে তেমনি এই গানে কন্যাকে বিদায় দেওয়ার পর মায়ের মন শোকে ভরে উঠে। নিম্নে গানটি দেওয়া হল—

> “শিল অত লড়ে চড়ে কাঁস অত ওমুরে
> কেন গো কনের মা তোর হিয়া বিদুরে।”[৮]

তেমনি আর একটি গানে গ্রাম বাংলার খেস ফুল অর্থাৎ পলাশ ফুলের সুন্দর বর্ণনা পায়। পলাশ ফুল দেখতেই সুন্দর কিন্তু কোন কাজে লাগে না। আবার গাছ থেকে পড়ে গেলে সৌন্দর্যটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। ঠিক তেমনি ভাবে মানব সংসারে এমন অনেক কন্যা আছে যারা কোন কাজের নয়। শুধু তার রূপ নিয়ে অহংকার করে কিন্তু তাদের এই রূপও বয়সের ভারে একদিন শেষ হয়ে যায়, ঠিক পলাশ ফুলের ঝরে পড়ার মতো। তাই ছেলের মা এমন এক কন্যাকে চায় যে, সর্বগুণসম্পন্না ও সকল কর্মে পারদর্শী। নিম্নে গানটি উল্লেখ করা হল—

> “খেস ফুলের বাগান দিয়ো না
> খেস ফুলটি ঝরে গেলে কোন কাজে লাগে না।”[৯]

দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলের ‘ভুতমুড়ি’ চালের গ্রহণযোগ্যতা না থাকলেও বাধ্য হয়ে এই অঞ্চলের অন্নাভাবী মানুষজন তা গ্রহণ করেন। সাথে কুত্তি (একপ্রকার কলাই) যা এই অঞ্চলে মাঠে ঘাটে সচরাচর চোখে পড়ে, তার তরকারি। দু’বেলা দুমুঠো

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – ii, April 2026, TIRJ/ April 2026/article - 90
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 727 - 731
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

অন্ন গরীব খেটে খাওয়া মানুষদের কাছে অনেক বড় প্রাপ্তি। নিম্নে আলোচ্য গানটির মধ্যে শ্বাশুড়ি ও বৌমার গঞ্জনার ছবি ফুটে উঠে—

"ভুতমুড়ি চালের ভাত কুত্তি তরকারি
খা বলতে খালি বৌ গো তুই এতই খিদাই ছিলি?"[১০]

আমরা দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলে দেখতে পাবো পানীয় জলের সমস্যা দীর্ঘদিনের। তাই অনেক 'জলমাসই' গানে জলের প্রসঙ্গ এসেছে। এই অঞ্চলে মানুষ জলকে 'মা ঠাকুরণ' বলে সম্মান করে এবং পুজো করে। বিবাহ বা অনুষ্ঠানে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়। সামান্য জলে কিছু হবে না তাই ঘটি ভর্তি স্বচ্ছ জলের প্রয়োজন। আলোচ্য গানে আমরা সেই বিষয়টি দেখতে পাবো—

"খুল খুল জল মা ঠাকুরণ কুচির কপাট খুল
টুকু টুকু জল দাও জল মাঠাকুরণ, খাব? না গিলাব?
ঘটি ভরে জল দাও জল মাঠাকুরণ রাজার/বালার বিয়া দিব।"[১১]

নিম্নে সংগৃহীত কিছু 'জলমাসই' গান দেওয়া হল—

১। "নেশা খাব বতুল বতুল নাচব টিয়া টিয়া
আজ আমাদের সাধের দেয়রের বিয়া।"[১২]
২। "খেজুর গাছে মেজুর বসেছে
হা ভাই তোরা খেদিস নারে আসা করে বসেছে
ভাই আমার আইল বিয়া করে
হা ভাই তোরা সরে দাঁড়া ভাজ নিব কোলে।"[১৩]

'জলমাসই' গানে আমরা দক্ষিণ বাঁকুড়ার নিম্নবর্গীয় বাঙালি সমাজের চিত্র পায়। তাদের রীতি-নীতি, আচার-সংস্কারের কিছু কিছু আমরা এই গানে লক্ষ্য করেছি। লোকসংস্কৃতিবিদ্ সুবীর মণ্ডল দক্ষিণ বাঁকুড়ার লোকসঙ্গীত প্রসঙ্গে বলেছেন—

> "লোকসঙ্গীত হল দলবদ্ধ মানুষের ভাব, ভাবনা ও জীবনবৃত্তের সাঙ্গীতিক প্রকাশ। সংখ্যাগোরিষ্ঠ মানুষের সার্থক প্রতিফলন লোকসঙ্গীতে ফুটে উঠেছে। এখানকার কৃষি, অরণ্য ও নদী নির্ভর মানুষই মূলত এর সার্থক রূপকার।"[১৪]

এই 'জলমাসই' গানগুলি যখন সমবেত কণ্ঠে শুনি তখন মনে হয়, এই গান তাদের জীবনের সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনাকে প্রকাশ করতে সাহায্য করে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় আমরা দেখেছি – এই গান শুধুমাত্র বিয়ের দিন ছাড়া বছরের অন্য কোন সময়ে গাওয়া হয় না। এই গান মূলত আচারভিত্তিক গান হলেও গানের মধ্যে দেখি, কন্যাকে বিদায় দিয়ে মায়ের হৃদয়ের ব্যকুলতা, কখনো দেখি শ্বাশুড়ি বৌমাকে খাবারের জন্য গঞ্জনা দিচ্ছে, কখনো নেশা খেয়ে উদ্দাম নৃত্যের ইচ্ছা প্রকাশ পেয়েছে। পারিবারিক জীবনে ব্যবহারিক প্রয়োজনের নানাদিক এই 'জলমাসই' গানে ফুটে উঠেছে। তাই আমাদের মনে হয়েছে এই গান প্রতিটি আচারের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেয়। নিষ্প্রাণ আচারকে সজীব করে তুলে। তাই এই 'জলমাসই' গান একান্তভাবে এই দক্ষিণ বাঁকুড়া অঞ্চলের বাউরি নারী সমাজের নিজস্ব সম্পদ।

Reference:

১. দাশ, জীবনানন্দ, *কাব্যগ্রন্থ*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা, বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃ. ১৪৩
২. *District Census Handbook, Bankura*, Series–20, Part XII–A, Census of India, 2011, p. 1040
৩) তদেব, পৃ. ১০৪০

৪. চৌধুরী, দুলাল ও সেনগুপ্ত, পল্লব (সম্পা.), *লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ*, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, দ্বিতীয় সংযোজন, ২০১৩, পৃ. ২১

৫. দে, গৌতম, 'জনবিন্যাস', *জেলা সংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ : বাঁকুড়া*, কলকাতা, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, এপ্রিল ২০০২, পৃ. ১

৬. দাস, সুনীল কুমার, *রাঢ় সভ্যতা*, জামুড়িয়া, বাউরীল্যান্ড পাবলিকেশন, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০৭, পৃ. ২৯

৭. চৌধুরী কামিল্যা, মিহির, *রাঢ়ের জনজাতি ও লোকসংস্কৃতি*, বর্ধমান, উচ্চতর বিদ্যাচর্চা কেন্দ্র, বাংলা বিভাগ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৬, পৃ. ৬৮

৮. ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত, তথ্যদাতা — ললিতা দুলে, গ্রাম : চন্দনপুর, থানা : খাতড়া, বয়স : ৫০, পেশা : দিনমজুর।

৯. ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত, তথ্যদাতা — ছবি দুলে, গ্রাম : চন্দনপুর, থানা : খাতড়া, বয়স : ৫২, পেশা : দিনমজুর।

১০. ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত, তথ্যদাতা — লক্ষ্মীকান্ত দুলে, গ্রাম : চন্দনপুর, থানা : খাতড়া, বয়স : ৩০, পেশা : দিনমজুর।

১১. ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত, তথ্যদাতা — প্রশান্ত দুলে, গ্রাম : চন্দনপুর, থানা: খাতড়া, বয়স : ২৮, পেশা : দিনমজুর।

১২. তদেব

১৩. ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত, তথ্যদাতা — লক্ষ্মীকান্ত দুলে, গ্রাম : চন্দনপুর, থানা : খাতড়া, বয়স : ৩০, পেশা : দিনমজুর।

১৪. মণ্ডল, সুবীর, *দক্ষিণ বাঁকুড়ার লোকজীবন ও সংস্কৃতি*, কলকাতা, লোক প্রকাশন, জানুয়ারি ২০০৬, পৃ. ২৫৬